International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-IV, May 2016, Page No. 1-13
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকসংস্কৃতি : লোকশিক্ষার প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন

অরুন সরকার
এম. ফিল. ছাত্র, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Though Sri Sri Ramakrishna didn't receive any formal education from school but he was a popular as well as great folk teacher. He conquered the mind of people by teaching them, through stories, songs, and religious advices. He believed that the ultimate aim of life is to experience god. From very poor people of rural Bengal to the educated urban youth, everybody ran to him to gain knowledge. Sri Sri Ramakrishna created the opportunity, so that people from various caste and religion can get education according to their needs and aspirations. He showed people the various ways so that they may get back their faith on god. For all this reasons, during 1870s he became the central figure of the renaissance for the educated intellectuals. Through different advice and sayings (aphorism) he circulated 'truth' which is very strong and not slippery. Sri Ramakrishna always tried to teach through his advice and sayings that human beings must know himself and by knowing himself he /she will also feel united with all other people, this is experiencing or witnessing god, which is also known as emancipation. The philosophy, religious advice, sayings, song, story and his enlightened thought have largely influenced the study of folklore. For this reason he is also considered as the connector between east and west as well as old and modern folklore. All these things are the topic of discussion in this paper.

Key Words: Folklore, Folk education, Saying, Philosophical thought, Religious advice.

১.ভূমিকা : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একজন মহান লোকশিক্ষক। তিনি ছোটো ছোটো গল্প, সংগীত ও ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে সকলের কাছে প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ঈশ্বর উপলব্ধির মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়ে মানুষকে সেইপথে চলতে নির্দেশ দেন। সেজন্য যে সব মানুষজন তাঁর কাছে গেছে তাদেরই তিনি 'কামিনী কাঞ্চন' ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেন কাম ও অর্থই মানুষকে ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত করে। তাই 'কাম-কাঞ্চন' বা 'কামিনী কাঞ্চন' ত্যাগের পথই তাঁর কাছে ছিল একমাত্র ঈশ্বরের পথ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই জগৎকে মায়া বলে উল্লেখ করতেন; কারণ জগতের অন্ধকার শক্তি 'অবিদ্যা মায়া' অথাৎ কোনো কিছুর প্রতি কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, নিষ্ঠুরতা, মানুষকে চেতনার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনে। আর এই মায়া যদি মানুষ ত্যাগ করতে না পারে তাহলে সংসারের কর্মবন্ধন তাকে আবদ্ধ করে রাখবে। অন্যদিকে সৃষ্টির আলোকময় শক্তি 'বিদ্যামায়া' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গুণাবলি, জ্ঞান, দয়া, শুদ্ধতা, প্রেম ও ভক্তি মানুষকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানের আলো দেখায় বলে তিনি মনে করতেন।[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সৃজনশীল শিক্ষকের মত সমগ্র মানুষের জীবনকে তুলে ধরে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর অনুরাগীরা তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তিনি মানুষকে সাধারণভাবে শিক্ষা না দিয়ে, তাদের আধারে সঞ্চার করেছিলেন শক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সূর্য যেমন তাঁর শক্তির একাংশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বিশ্বজগৎকে আলোকিত করে, তেমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঞ্চিত বিদ্যাশক্তির একাংশ উৎসর্গ করে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করেছিলেন। আর সেই জন্যই তিনি নিজেকে সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন যাতে নিজেকে অন্যের জন্য পুরোপুরি উজাড় করে দিতে পারেন।[২] তিনি সবসময়ই সমস্যাপীড়িত মানুষদের সমস্যা সমাধানের জন্য পথ দেখাতেন। তিনি কখনও কোনো মানুষকে তিরস্কার করে বলেননি যে, 'তোর দ্বারা কিছু হবে না'; তিনি জানতেন যে, জগন্মাতার সৃষ্টির পরিকল্পনায় প্রত্যেক মানুষেরই এই পৃথিবীতে একটা নিদিষ্ট স্থান বা সামাজিক অবস্থান আছে। এজন্য তাঁর কাছে যে সমস্ত মানুষজন গেছে তাদের তিনি শুধু শিক্ষায় দেননি তাদের জীবনেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

২. লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষা : মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই এক একটি সামগ্রিক একক রূপে আবির্ভূত হয়। প্রকৃতি তাকে সংশ্লেষণ করে, আর সৃষ্টি সেই সংশ্লেষণের ধারায় তার অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলে। কিন্তু মানুষের বিশ্লেষণী মন, বিচারধর্মী মন, সেই সৃষ্টিকে জানবার জন্য বিভিন্ন ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের বিশ্বাস, এই অনুশীলনের ফলেই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। আর আমাদের মানব জীবনও সৃষ্টির এই সংশ্লেষণী নিয়মেই আবদ্ধ। কারণ, তাকে গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে মানুষের জীবনেরও দু'টি দিক রয়েছে। একটি হল তার জৈবিক সত্তার দিক, আর একটি হল তার সামাজিক সত্তার দিক। এই উভয় দিকের সমন্বয়ের মধ্যে দিইয়েই মানুষের জীবন প্রবাহ আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই কারণে মানুষের জীবনের স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে গেলে যেমন সকল রকম জৈবিক চাহিদার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তেমনি সমাজ জীবনে সুস্থভাবে জীবনযাপনের স্বার্থে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তিও তার দিক থেকে একান্তভাবে প্রয়োজন।[৩] এই কারণে লোকসমাজের বা মানুষের জীবনে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক চাহিদার সৃষ্টি হয়, তা একান্তভাবে পরিতৃপ্তি করতে পারে লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষা।

২.১ লোকসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ধারণা : লোকসংস্কৃতি লোকায়ত মানুষের সৃষ্টি, যা মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী সংহত সমাজের সমষ্টিগত জীবনচর্চা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি, যা মূলত জৈবিকসত্তার প্রয়োজনবোধ, বাস্তবজীবনবোধ ও শিল্পরুচিবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের মিলিত রূপ। লোকসংস্কৃতি শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই 'লোক' আর 'সংস্কৃতি', 'লোক' বলতে বোঝায় একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন যখন বংশ পরম্পরায় একই রকম আচার-আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, একই রকম খাদ্যাভাসে অভ্যস্ত, তাদের শিল্প সাহিত্য, সংগীত, লৌকিক দেব-দেবী, লোকাভিনয়, একই জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুষ্ট করে অর্থাৎ একই রকম রাজনৈতিক, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে জীবনধারা দোলায়িত হয়, তখন সেই ঐতিহ্য নির্ভর সংহত গোষ্ঠী লোক বলে বিবেচিত হয়। আর এই সমস্ত মানুষদেরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সংস্কৃতি আবর্তিত হয় তাকেই লোকসংস্কৃতি বলা হয়। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা সংহত ব্যাক্তিমানুষ অথবা সমগ্র সমাজ, লোকসংস্কৃতি সমগ্র সমাজে আজও স্বীকৃত বলেই এর রেণু সমূহ সজীব, সচল, প্রাণবন্ত বলেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ত্রিবেণীস্পর্শী হয়ে অনন্তকাল বিস্তৃত হয়ে চলেছে।[৪]

লোকসংস্কৃতি অতীতের হয়েও একটি জীবন্ত ধারা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন-প্রাচীন হয়েও চিরনতুন। লোকসংস্কৃতিবিদ্ সি.এফ.পটার বলেছেন: "Folklore is lively fossil which refuses to die."[৫] Y.M. Sokolov বলেছেন: 'লোকসংস্কৃতি অতীতের প্রতিধবনি হয়েও বর্তমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর'। তাঁর ভাষায়: "Folklore is an echo of the past, and at the same time it is vigorous voice of the present."[৬] লোকসংস্কৃতি একটি বৃক্ষের মত এর শিকড় অতীতের গভীরে গ্রথিত; কিন্তু তা ক্রমাগত নতুন শাখা, নতুন পাতা ও ফল উৎপন্ন করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও গবেষক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতটি স্মরণীয়:

> "লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহতসমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজের অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রবর্তী সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র, শিক্ষাগত অতিপ্রযত্ন নিরপেক্ষ প্রধানত ঐতিহ্যশ্রয়ী।"[৭]

লোকসংস্কৃতির উপযুক্ত সংজ্ঞার যে ইংরেজি প্রতিরূপ সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম ভারতীয় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসাবে গৃহীত হয়, সেটি হল:

> "Folklore is the total creation of the life-practice and the ideational-pursuit of mainly collective spontaneous and anonymous effort of an integrated society."[৮]

লোকসংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্বন্ধপাতের সচলতায় আদিম সমাজের হারানো অতীতে মূল গ্রথিত করে বিবর্তনের ধারায় চলমানকালের সত্যে উদ্ভাসিত হয়েও আগামি দিনের বাতাবরণে সম্প্রসারিত। তাই লোকসংস্কৃতি অতীতের প্রতিধ্বনি হয়েও বর্তমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

২.২ লোকসংস্কৃতির উপাদান : লোকসংস্কৃতি বা Folklore বিষকে অনুধাবনের জন্য তার উপাদান বৈচিত্রকে জানা প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতিবিদে্রা যেমন নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তেমনি নানাভাবে বর্গীকরণও করেছেন। এক্ষেত্রে মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ্ আর. এম. ডরসন (R. M. Dorson) বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন অধ্যায়নের জন্য এ-বিষয়কে চারটি বর্গে বিভক্ত করেছেন। বর্গগুলি হল যথাক্রমে: ১. মৌখিক সাহিত্য (Oral literature), ২. বস্তুগত সংস্কৃতি (Material culture), ৩. সামাজিক লৌকিক প্রথা (Social folk customs) এবং ৪. লোকঅভিকরণ শিল্প (Performing folk art)। এই বর্গবিভাজনটি লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা লোকসংস্কৃতির উপাদান বৈচিত্র্য সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ লোকবিজ্ঞানের প্রধান ১২টি শাখার উল্লেখ করেছেন: ১) গাথা, ২) উপকথা, ৩) ছড়া, ৪) পল্লীগান, ৫) প্রবাদ, ৬) হেয়াঁলী, ৭) পুরাণ কথা, ৮) লোকাচার, ৯) লোকসংস্কার, ১০) খেলাধূলা, ১১) খাওয়া-দাওয়া, ১২) হস্তশিল্প।

প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. দুলাল চৌধুরী বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংক্রান্ত আলোচনায় লোকসংস্কৃতিকে ২৪টি ভাগে ভাগ করেছেন: ১) ছড়া, ২) গীত/গান, ৩) ধাঁধা, ৪) প্রবাদ-প্রবচন, ৫) কথা- রূপকথা, উপকথা, ইতিহাসকথা, ব্রতকথা, ৬) গীতিকা/গাথা, ৭) লোকনৃত্য, ৮) লোকউৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা, ৯) আচার, মন্ত্র, তত্র, ১০) লৌকিক দেব-দেবী, ১১) লোকনাট্য, ১২) লোকশিল্প, ১৩) লোকভাষা, ১৪) লোকাচার, ১৫) লোকবিশ্বাস-সংস্কার, ১৬) লোকদর্শন, ১৭) লোকক্রীড়া, ১৮) লোক ঔষধ, ১৯) কিংবদন্তী, ২০) লোকবাদ্য, ২১) লোকচিত্র, ২২) লোক অলংকার সজ্জা, ২৩) লোকযান, ২৪) লোকঐতিহ্য।

আবার ড. আশরাফ সিদ্দিকি তাঁর 'লোকসাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে মূলত লোকসংস্কৃতির ১৩টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন: ১) ধাঁধা, ২) ছড়া, ৩) মন্ত্র, ৪) খেলাধূলা, ৫) লোককথা ও লোককাহিনী, ৬) লোকপুরাণ, ৭) কিংবদন্তী, ৮) প্রবাদ, ৯) গীতিকা/গাথা, ১০) গীতি ও গান, ১১) লোকঔষধ, ১২) উৎসব ও অনুষ্ঠান, ১৩) বিবাহ উৎসব-ঈদ উৎসব-দুর্গোৎসব।

২.৩ লোকশিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় : প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্থায়িত্বকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈবিক চাহিদার প্রয়োজন হয়; তেমনি লোকসমাজের মানুষদের যে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক চাহিদার সৃষ্টি হয় তা একান্তভাবে পরিতৃপ্তি করতে পারে লোকশিক্ষা। এই 'লোকশিক্ষা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই 'লোক', যার অর্থ সাধারণ মানুষজন বা 'জনসমষ্টি' আর দ্বিতীয়াংশ 'শিক্ষা', যার অর্থ হল শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা নির্দেশ দেওয়া। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে থেকে স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন

করে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে। তেমনি লোকসমাজের মানুষেরা সহজাতভাবে লোকশিক্ষাকে পেয়ে থাকে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে থেকে বা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা থেকে। তাই মনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে, আবেগের দিক থেকে সকল লোকসমাজকে সবল ও সক্ষম করাই হল লোকশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এইসব মানুষদের অবশ্য শুনতে, দেখতে এবং ভাবতে শিখাতে হবে এবং তাদের নিজেদের শক্তিকে ব্যবহার করার কৌশলগুলি জানাতে হবে। লোকশিক্ষা হল লোকের শিক্ষা, লোকের জন্য শিক্ষা, লোকসংস্কৃতির দ্বারা শিক্ষা।

২.৪ লোকশিক্ষার উপাদান : লোকশিক্ষার উপাদান বলতে সম্পূর্ণ লোকশিক্ষা প্রক্রিয়ার এমন কতকগুলি অংশকে বোঝায়, যেগুলির ক্রিয়াশীল সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ একটি লোকশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অবশ্য লোকশিক্ষা যখন অসংগঠিত আকারে লোকসমাজের মধ্যে সংগঠিত হত তখন যে তার মধ্যে এই উপাদানগুলি ছিল না এমন কথা বলা যায় না। লোকশিক্ষার উপাদানগুলি হল: **১) শিক্ষার্থী:** গ্রামের চাষী, শ্রমিক, কামার, কুমোর বা লোকসমাজের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষজন; **২) শিক্ষক:** লোকগায়ক, কথকঠাকুর, যাত্রাওয়ালা, পটুয়া, বাউল প্রকৃতি শিল্পীসমাজ; **৩) বিদ্যালয়:** খেলারমাঠ, চন্ডীমন্ডপ, বৈঠকখানা, গাছতলা প্রভৃতি স্থান; **৪) পাঠক্রম:** লোকগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনের সবরকম সমস্যা সমাধানের এবং আধুনিকবোধে উত্তরণের উপাদানগুলি।

৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদেব পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার শ্রীরামপুরের কামারপুকুর গ্রামে ১৮৫৭ শকাব্দের ৬ ফাল্গুন (১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ফেব্রুয়ারি), শুক্লপক্ষ, বুধবার, এক দরিদ্র ধর্মনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর চতুর্থ সন্তান হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদেব। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা মাতার সন্মুখে বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। সন্তান সম্ভাবা শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, "একদিন যুগীদের শিব-মন্দীরে দাঁড়িয়ে ধনীর সঙ্গে কথা বলার সময় দেখেছিলেন মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে দিব্যজ্যোতি নির্গত হয়ে মন্দির পূর্ণ করে বায়ুর ন্যায় তরঙ্গ বেগে ছুটে এসে তার গর্ভে প্রবেশ করে ঐ জ্যোতি যেন উদরে প্রবিষ্ট হয়েছে। এর পর তাঁর গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হয়েছে বলে প্রতিবেশী ধবনিকে বলেছিলেন।"[৯] শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গয়ায় গিয়ে একদিন গদাধর বিষ্ণুকে স্বপ্নে দর্শন করেন, সেই কারণে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নবজাতকের রাশ্যাশ্রিত নাম শম্ভুচন্দ্র বলে নির্ধারণ করার সত্ত্বেও গয়াধামের স্বপ্নের কথা স্মরণ করে বালকের নাম রাখলেন গদাধর।

শ্রীরামকৃষ্ণ শৈশবে গদাই নামে পরিচিত ছিলেন। অংকন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তাঁর ছিল সহজাত দক্ষতা। যদিও তাঁর প্রথাগত শিক্ষার প্রতি মনযোগ ছিল না, এজন্য বাংলাভাষাও ভালো করে শিক্ষা করেননি। যখন তাঁকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, 'লেখা পড়া শিখে কি করিব? তার ফল তো কেবল 'চালকলা' এমন বিদ্যা আমি শিখিব না'। তাঁর মেধাশক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে, কোনো বিষয় যখন তিনি করতেন তৎক্ষনাৎ তা তাঁর অভ্যাস হয়ে যেত। এইভাবে যাত্রা, কীর্তন, চন্ডীরগীত ও নানাবিধ সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠস্থ হয়েছিল।[১০] এজন্য পাঠশালায় ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে 'চালকলা বাঁধাবিদ্যা' (অর্থাৎ পুরোহিতের জীবিকা উপার্জনশীল শিক্ষা) বলে উপহাস করতেন। তবে পাঠশালার প্রতি উদাসীন থাকলেও নতুন কিছু শিখতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিলনা। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের নামতা তাঁর মুখস্থ হত না, শুভংকরী ধাঁধা লাগত। মাতৃভাষা বাংলায় তাঁর অক্ষর জ্ঞান ছিল, কিন্তু সংস্কৃত অনুধাবনে সক্ষম হলেও সে ভাষা তিনি বলতে পারতেন না।[১১]

৩.১ দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়িতে পৌরহিত্য : ১৮৬৬ সালে তাঁর অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যু হলে গদাধর তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। মন্দিরের উওর-পশ্চিম আঙ্গিনায় একটি ছোটো ঘরেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর অবশিষ্ট জীবন। এই সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা বৃদ্ধিপায়, পূজা করতে করতে চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন এবং সারাদিন মা মা করতে থাকেন। রাত্রি কালে নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্র উপবিত ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান করতে থাকেন। এরপর তিনি কালীর নিকট সম্পূর্ণ নিজেকে সমর্পণ করেন। কি দার্শনিক কি সাধারণ, সকল ক্ষেত্রেই বালকসুলভ আনুগত্য নিয়ে দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন।

৩.২ বিবাহ : ১৮৫৯খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বছরের কন্যা সারদার সঙ্গে শাস্ত্র মতে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ছিল ২৩ বছর। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে সারদা দেবীকে ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের আগে তাদের আর সাক্ষাৎ হয়নি।

৩.৩ সাধনা : বিবাহের পর তিনি পুনরায় কলকাতায় পত্যাবর্তন করে মন্দিরের কাজ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের জ্যাতাভিমান দূর করার জন্য তিনি তথাকথিত নিম্ন বর্গীয়দের হাতে খাদ্য গ্রহণ, অন্ত্যজ পরিবারের সেবা করতে থাকেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন "টাকা মাটি, মাটি টাকা" এবং অর্থকে লোষ্ট্রজ্ঞানে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন।[১২] তখন লোকে বলতে থাকে যে শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তায় সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। এরপর মন্দিরের কাজকর্ম তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পরল। কোন একজন চিকিৎসক বললেন যে রূগীর এই অবস্থার কারণ আধ্যাত্মিক উত্তেজনা, কোনো ঔষধ একে সুস্থ করতে সক্ষম নয়।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট তন্ত্রসাধনা সম্পূর্ণ করেন। এরপর বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা সম্পূর্ণ করে, ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তোতাপুরীর নিকট বৈদান্তিক সাধনা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ রায়ের নিকট ইসলাম ধর্মের সাধনা করেন, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শম্ভুচরণ মল্লিক তাঁকে বাইবেল পাঠ করে শোনালে তিনি খ্রিষ্টীয় মতের সাধনা করে যিশু খ্রিষ্টের চিত্রে তিনি জীবন্ত যিশুর দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। এইসব বিভিন্ন ধর্মমতের অভ্যাস করে উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল মতই একই ঈশ্বরের পথে মানুষকে চালিত করে।

৩.৪ ভক্ত ও শিষ্য : শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ্য শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় কুমার সেন প্রমুখ। ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য হিসাবে ছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত, কালি প্রসাদ চন্দ্র, তারকনাথ ঘোষাল, শশীভূষণ চক্রবর্তী, শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। নারীদের মধ্যে ছিল গৌরি মা ও যোগীন মা উল্লেখ যোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল জাতি, সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ তাঁর কাছে আসতে শুরু করে। কি মহারাজ, কি ভিখারি, কি পন্ডিত, কি শিল্পী, কি ব্রাহ্মণ, কি খ্রিষ্টান, কি মুসলমান সকল ধর্মের ও সকল পেশার আবালবৃদ্ধ-বনিতা মানুষ তাঁর কাছে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

৩.৫ ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক সমাজে প্রভাব : ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রভাবশালী ব্রাহ্মনেতা কেশব চন্দ্র সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বহু দেববাদ গ্রহণ করেন। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, ম্যাক্সমূলার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড. ডব্লিউ হেস্টিং, উইলিয়াম ওয়ার্ড ওয়ার্থ প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

৩.৬ শেষ জীবন: ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লার্জিম্যানসথ্রোট রোগে আক্রান্ত হন, ক্রমে এই রোগ গলায় ক্যান্সারের আকার ধারণ করে। চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁকে কথা বলতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সেই র্নিদেশ অমান্য করে অভ্যাসগত ভাবে ধর্মালাপ চালিয়ে যান। মৃত্যুর আগে তিনি বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, "আজ তোকে যথা সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি। এই শক্তির সাহায্যে তুই দেশের অশেষ কল্যান করতে পারবি। কাজ শেষ হলে আবার যথাস্থানে ফিরে যাবি।"[১৩] তিনি তাঁর ত্যাগী সন্ন্যাসীদের ভার বিবেকানন্দকে দিয়ে যান। অবশেষে ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর শিষ্যদের কথায় মহাসমাধি।

৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী ও দর্শন : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অমৃতবাণী ও দর্শনের মাধ্যমে সত্যের প্রচার করেছেন। আর এই সত্যই হল কলির তপস্যা। প্রত্যেক মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কারণ এই সত্যের আর এক নামই হল ঈশ্বর। তাই মানুষকে এমন চরিত্রশক্তি লাভ করতে হবে যাতে মানুষ কখনও কিছুতেই সত্য থেকে বিচ্যুত হতে না পারে। এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে মানুষ সবসময় নিজেকে দর্শন করে, সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। যাকে আমরা ঈশ্বর দর্শন, আত্মজ্ঞান বা মুক্তিলাভ বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সব উপদেশ ও বাণীর মধ্যে দিয়ে এই অবস্থা লাভেরই পথনির্দেশ করেগেছেন। তাঁর এই আলোকপ্রাপ্ত ভাবনা ও চর্চা সমূহ দর্শনের অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। সেই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও

আধুনির দর্শনের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ সূত্ররূপে তাঁকে গণ্য ও মান্য করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী ও দর্শনের কয়েকটি সংক্ষেপে বিবৃত করা হল:

"মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরলাভ, কারণ কেবল তাঁর দ্বারাই স্থায়ী পরিপূর্ণতা ও সন্তোষ লাভ করা।"[১৪] ঈশ্বরে দর্শন লাভ করতে পারলে কোনো ভয় থাকে না, কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা স্থায়ীভাবে কোনো কঠিন কাজকে ও সহজভাবে করতে পারি।

> "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। "আমি কে" ভালরুপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদির কোনটা আমি। যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরুপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই না। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা-চৈতন্য।"[১৫]

আমরা যদি নিজেকে ভালোভাবে বিচার করি, আমি কে? কোথায় থেকে আমার উদ্ভব হল, আমার শরীরের কোন অংশে আমি তা খুঁজে পাই না। যদি আমার মধ্যে চৈতন্যই না থাকে তা হলে আমি বলে কিছুই হয় না। এজন্য আগে নিজের মনকে জানতে হবে, তা হলেই সব পাওয়া যাবে।

> "সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীর পুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের দিকে চেয়ে থাকে। বাউল যেমন দুই হাতে দু'রকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, হে সংসারী জীব তোমরা ও তেমনি হাতে সমস্ত কাজকর্ম কর, কিন্তু মুখে সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ করতে ভুলো না।"[১৬]

মানুষ যদি সংসারের কাজ করতে করতে ঈশ্বরের সাধনা করে, তাহলেও কোনো দোষ নেই। আমরা এখনও গ্রাম-বাংলার অনেক মানুষকে দেখি মাঠে কাজ করছে আবার মুখে সবসময় হরিনাম করে ঈশ্বরকে ডাকছে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা সবসময় গেরুয়া পোশাক পরে সাধুর ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু মুখে ঈশ্বরে নাম করতে দেখা যায় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সংসারী মানুষদের বলতেন তোমারা সংসার কর কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম জপ করতে ভুলো না।

> "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব- সব পরস্পর ঝগড়া, এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্ম ঠিক, আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হল। অনন্ত পথ অনন্ত মত।"[১৭]

বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে প্রায়ই খুনো-খুনি, কাটা কাটি লেগেই আছে। কিন্তু আমাদের এই বুদ্ধি নাই যে আমরা যাকে কৃষ্ণ বলছি, তাকেই শিব, আধ্যাশক্তি, যীশু, তাকেই আল্লা বলা যায়। এক ঈশ্বর তাঁর হাজার নাম। যার যাকে ভালো লাগে সে তাকে ডাকবে, সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আমি বাড়ি যাব তা পায়ে হেঁটে হোক বা সাইকেলে চেপে বা গাড়িতে করে যে কোনভাবে বাড়িতে যেতে পারলেই হল।

> "যার তৃষ্ণা পায় সে কি তখন গঙ্গার জল ঘোলা ব'লে একটা পুকুর কেটে জল পান করতে যায়। তেমনি যার ধর্মতৃষ্ণা হয়নি, সে এ ধর্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম ঠিক নয় এরূপ ব'লে গোলমাল করে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাকলে অত বিচার চলে না। ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা ভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে কিন্তু একটির উপর প্রাণঢালা ভালবাসার

নাম নিষ্ঠা। রামরূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগত না। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে তারা দ্বারকার পাগড়িবাঁধা কৃষ্ণ দেখতে চাইল না।"[১৮]

আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, অথচ তারাই বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে বেড়ায়। ধর্ম সম্পকে যেসব মানুষের কোনো ধারণা নেই, তাদের যদি ধর্মের কথা শুনতে বলা হয়, তখন দেখা যায় তারাই বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে তর্ক করছে। অর্থাৎ যার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আছে , সে কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গোলমাল পাকায় না, সে বলে ঈশ্বর একজনই আছেন তিনি মানুষকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে মানুষকে দেখাদেন।

ব্রহ্ম-শক্তির ভেদাভেদ শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যেমন জলাশয়ের জল যখন স্থির থাকে, তখন তাকে ব্রহ্ম বা সৎ অথবা পুরূষ বলা যায়, কিন্তু তাতে ঢেউ উঠলে, শক্তি বা প্রকৃতির ভাব এসে যায়। যখন কোন কাজ নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল, সুমেরূবৎ। কাজ আসলেই শক্তির খেলা বলতে হবে। কিন্তু প্রকৃতভাবে ব্রহ্ম ও শক্তির ভেদ নাই, তা একেবারেই বিশেষ পরিস্থিতি নির্ভর করে থাকে। যেমন:

"ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি। কারণ একের আশ্রয়ীভূত আর একটি, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখিত। যেমন, বৃক্ষ পুরুষ ও তদ্বেষ্টিত লতা স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তুমি একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিলে, চিত্রটি তোমার চিত্রকরা শক্তি হইতে তোমার দ্বারা জন্মিল, এজন্য তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকরা শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটি সন্তানবিশেষ। সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমরা সব সন্তানস্বরূপ।"[১৯]

৫. লোকশিক্ষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবদান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ না করেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭০ দশকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদের নিকট তিনি হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু নবজাগরণের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি বাঁধাধরা বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবর্তে অপ্রথাগত শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে ছোটো ছোটো গল্প ও ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে তিনি মানুষকে লোকশিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা বা যার দ্বারা সাধারণ জনগণের ও জগতের কল্যান করা যাবে সেইরূপ শিক্ষাই লোকশিক্ষা। যেহেতু ঈশ্বর উপলব্ধিই মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে তিনি মনে করতেন, তাই লোকশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল সক্ষমতা ও সচেতনতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত, ছোটো ছোটো গল্প ও ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার মানুষকে শিক্ষা দিয়ে সক্ষম ও সচেতন করার প্রয়াস করেছিলেন। সেই সব গল্প, সঙ্গীত ও উপদেশগুলির কয়েকটি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল:

সঙ্গীত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিয়ে গ্রাম বাংলার মানুষকে সক্ষম ও সচেতন করে তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 'যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে-গো, ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে'। সে যদি বলে আমি এমন কাজ আর কখনও করবো না, তা হলে তার কোনো কিছুতেই ভয় হয় না, সে যদি ঈশ্বরে প্রতি বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হয়। এরূপ একটি গান হল:

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি"।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রুণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।"[২০]

ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে গিয়ে তার অনন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা তাঁর সাধনা করলে জ্ঞানের বাতি জ্বলবে প্রাণ হৃদয়ে। ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে পারলে সব কিছু খুজে পাওয়া যাবে নিজের প্রাণের মধ্যে। এই জন্য

নিজের মনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, তাহলেই জ্ঞানের বাতি জ্বলবে প্রাণের মধ্যে। গয়া, কাশি, বৃন্দাবন, মথুরা সব নিজের হৃদয় মাঝেই পাবে। এরূপ একটি গান হল:

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রুপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।"[২১]

ঈশ্বরে প্রেম হলে বাইরের জিনিস ভুল হয়ে যাবে। এই বিশ্বজগৎও ভুল হয়ে যাবে, নিজের দেহ যে এত প্রিয় বিষয়, যার জন্য আমরা দিন-রাত পরিচর্চা করি, তাত্ত যেন ভুল হয়ে যাবে, সংসারের প্রতি মনযোগ থাকবে না। এরূপ একটি গান হল:

"সে দিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে?)
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে?)।"[২২]

ঈশ্বর অন্তর্যামী তাঁকে আমরা যদি সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা করি তাহলে তিনি আমাদের সব বুঝিয়ে দিবেন। এই জন্য লজ্জা, অহঙ্কার, গৌরব সব ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হলে তার কাছ থেকে সব পাওয়া যাবে। এ জন্য একমনে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাঁর শরণাগত হলে মনের যাবতীয় বাসনা তিনি পূর্ণ করে দেবেন। ঈশ্বর হলেন সব কিছুরই খনি, এই জন্য নিজের মনের মধ্যে আগে তাঁকে স্থাপন করতে হবে। এরূপ একটি গান হল:

"আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।"[২৩]

কেউ ঐশ্বর্যের বিভব, মান, পদ এই সবের অহঙ্কার করে। এসব দুই দিনের জন্য; মৃত্যুর পর কিছুই সঙ্গে যাবে না। সবই পড়ে রবে, মৃত্যুর পর যে তোমার সবচেয়ে প্রিয় সেও কয়েক দিনের পর ভূলে যায়। এজন্য ঐশ্বয্য, মান, টাকা পয়সার অহঙ্কার, এগুলি মাত্র কয়েক দিনের জন্য মানুষকে মায়ায় বদ্ধকরে রাখে। আর এই সব বিষয়গুলিই মানুষকে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে সচেতন করেছিলেন গানের মাধ্যমে:

"ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।।
দিন দুই তিন দিনের তরে কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে।।
যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে।।"[২৪]

যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায় ততক্ষণ সব মিথ্যা। তখন মানুষ তাকে ভুলে আমার আমার করে, মায়ায় বদ্ধ হয়ে কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে। মায়াতে মানুষ এমনই অজ্ঞান হয় যে মুক্তির পথ আছে তবুও মুক্ত হতে পারে না। এজন্য তিনি মানুষকে সচেতন হওয়ার জন্য গান ধরেছিলেন:

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে।।
বিল ক'রে ঘুর্ণী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।।
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার নালে আপনি মরে।।"[২৫]

আমরা দেখেছি সংসার অনিত্য, তবু সংসারের যত লোক জন্মায় তারা আবার মৃত্যুবরণ করে। মানুষ সংসারে এই আছে এই নেই, যাদেরকে আমরা, আমার আমার করি, চোখ বুজলে তাদের আর পাই না। তবু লোকেরা আমার ছেলে, কি খাবে, কি করবে, এই সব চিন্তার জন্য নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে মায়াতে বদ্ধ হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে পারে না। মাছ যেমন ঘুণিপাতে পড়ে পালালেও পালাতে পারে, কিন্তু পালায় না। আবার গুটি পোকা যেমন নিজের জ্বালে নিজেই মরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছোটো ছোটো গল্প বলেছেন। আর এইসব গল্পগুলির মাধ্যমে মানুষকে সচেতনও সক্ষম করেছিলন। কামিনী কাঞ্চন থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি যে গল্পটি বলেছিলেন সেটি হল:

'নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। বীরভদ্রের একদিন ভয় হলো কারণ, এরা সিদ্ধ হয়ে লোককে যা বলবে তাই ফলবে; কেন না, লোকে না জেনে যদি কোন অপরাধ করে, তা হলে তাদের অনিষ্ট হবে। এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হল। আবার ধ্যান করতে করতে ভাঁটা পড়েছে তবুও তাদের হুস নাই। তেরশোর মধ্যে একশো জন বুঝেছিলেন বীরভদ্র কি বলবেন, তাই তারা দেখা করলেন না। বাকী বারশো দেখা করলে বীরভদ্র তাদের বললেন, এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে কর। ঐ বারশো এখন প্রত্যেকের সেবাদাসীদের সঙ্গে থাকতে লাগলো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেন না, সে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়। এর কারণ কেবল 'কামিনী' বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলার যো নাই। তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।'[২৬]

শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণ; জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুর সেবায় চলে; আবার কোনও জলে আঁচালো, বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা কেবল চলে। কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবায় চলে না। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, তবে ভালো লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; কিন্তু মন্দ লোকের থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তাই বলে বাঘকে আলিঙ্গন করে চুমু খাওয়া চলে না। আমাদের সমাজেও এমন অনেক লোক আছেন, যাদের কাছ থেকে সবসময় সচেতন থাকতে হয়। তা ছাড়া বিপদে পড়তে হয়। এরকম একটি গল্প হল:

'কোন এক বনে একটি সাধু থাকতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য বনে হোমের কাঠ আনতে গেলে রাস্তাদিয়ে পাগলা হাতী আসছে দেখেও সে পালাল না। কারণ সে জানে হাতীও নারায়ণ, এই ভেবে দাঁড়িয়ে রইল। মাহুত চেঁচিয়ে পালাও পালাও বলছে তবু সে নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে পাশে ছুড়ে ফেলে দিল। এরপর সংবাদ পেয়ে অন্যান্য শিষ্যরা ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে গেল। সুস্থ হলে গুরু জিজ্ঞাসা করল হাতী আসছে দেখে তুমি পালালে না কেন? সে বললে নারায়ণ মানুষ, জীব, জন্তু সবই হয়েছেন, তাই হাতী নারায়ণ আসছে দেখে পালায়নি। গুরু তখন বললে, বাবা হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য, কিন্তু বাবা মাহুত নারায়ণ তো তোমায় পালাতে বলেছিল। যদি সবই নারায়ণ তবে তাঁর কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।'[২৭]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অমৃতবাণী ও উপদেশের মাধ্যমে লোকমানুষকে সচেতন ও সক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দিয়ে মহান লোকশিক্ষকের স্থান দখল করেছেন। সেগুলির কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হল:

সংসারী লোকেদের তিনি বলেছিলেন- সংসার কর না কেন তাতে তোমার কোনো দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে করো, তাহলে দেখবে সে বাড়িঘর পরিবার তোমার নয়, এই সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে, আর বলি যে, তাঁর পাদ পদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা তাঁর প্রার্থনা করবে। সে জন্য সক্ষম হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে বলেছিলেন: "তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়; তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ লাভ করে তবে সংসারে হাত দিতে হয়। তাহলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় না।"[২৮]

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে মানুষের মধ্যে মারা-মারি, খুনো-খুনি লেগেই আছে। আর সেই কারণে সকলকে সচেতন করার জন্য তিনি বলেছিলেন:

> "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে- এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব- সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক, আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হল। অনন্ত পথ- অনন্ত মত। চিত্রশুদ্ধি না হ'লে ভগবান্ দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ এসব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়।"[২৯]

৫.১ লোকসংস্কৃতি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিতান্ত গ্রামের এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যে কারণে গ্রাম্য মাটির মানুষের প্রতি তাঁর যে টান তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি গ্রামের মানুষের সংস্কৃতি থেকেও নানান প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করে সেগুলির চর্চা করেছিলেন। তিনি ছোটো বেলায় গ্রামের রাখাল বালকদের সঙ্গে নানা প্রচলিত গ্রাম্য লোকক্রীড়ায় মত্ত থেকে আনন্দ অনুভব করতেন। গ্রামের অন্য রাখাল বালকের মত তিনিও পাড়ার মধ্য বয়স্ক মহিলাদের স্নানের ঘাটে গিয়ে বিরক্ত করে নানান কটু কথা শুনে আনন্দ পেতেন। কখনও আবার পৌরাণিক যাত্রাপালা রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতেন। এছাড়া ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতিও তাঁকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়েছিল। যে জন্য গ্রামের প্রচলিত মানুষদের পূজা-পার্বণ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রকার সংস্কার তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত। গ্রামের কোথাও কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে তিনি সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি গ্রামের কুমোর পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তাদের মাটির প্রতিমা তৈরি করতে দেখে, নিজে অভ্যাসগতভাবে সেইরূপ সুন্দর মাটির প্রতিমা তৈরি করতেন। গ্রামের লোকশিল্পীদের কাছ থেকে গ্রাম্যনাটক, যাত্রাপালার অভিনয় দেখে এসে তিনি তা অনুরূপভাবে অভিনয় করতে পারতেন। এ-বিষয়ে তাঁর সহজাত প্রতিভা ছিল। গ্রামের মহিলারা তাঁর কাছ থেকে নানান প্রকার সঙ্গীত, ধর্মীয় কথা শুনে আনন্দ অনুভব করতেন। এছাড়া তিনি নিজে গ্রামের বন্ধুদের নিয়ে যাত্রাদল গঠন করে গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে অভিনয় করতেন। তিনি অনেক সময় সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে ধর্মীয় কথাবার্তা ও বাক্যালাপের মাধ্যমে মত্ত থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম-বাংলার মানুষের ভাষাতেই বেশি কথাবার্তা বলতেন, যার মধ্যে লোকভাষার সুরই প্রতিফলিত হত। আর তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে লোকসুরে ও বিভিন্ন লোকবাদ্যের তালেই গান করতেন।

৫.২ জনশিক্ষা প্রসারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবদান : জনশিক্ষা প্রসারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন জনপ্রিয় মহান ব্যাক্তিত্বের অধিকারি। তিনি ছোটোবেলা থেকেই বাঁধাধরা বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবর্তে জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। তিনি গরীব দীন দুঃখী, চাষী, কামার, কুমোর, রসিক, মেথর, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরও একইভাবে শিক্ষা দেবার কথা বলেছিলেন। তিনি যখন ধর্মীয়শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন তখন বাংলায় ধর্মীয় বিপ্লব চলছিল। মানুষ যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে চরম দুর্দশায় ভুগছিল

তখন তিনি সকল মানুষকে কাছে টেনে বিভিন্নভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মানুষদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে। গ্রাম-বাংলার দিন আনে দিন খায় এমন মানুষ থেকে শুরু করে শহরের উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি ব্যাক্তিবর্গও তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দলে দলে ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষজন ডাক্তার, উকিল, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক, কামার, কুমোর প্রভৃতি মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দিয়ে শুধু সম্প্রদায় গঠনের পত্তন করেছেন তাই নয়, গ্রাম-বাংলার কৃষক, দীন দুঃখী, রসিক, মেথর, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরও তিনি একইভাবে শিক্ষা দিয়ে কাছে টেনেছিলেন।

৫.৩ লোকশিক্ষকের ভূমিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও একজন মহান লোকশিক্ষক ছিলেন। তিনি গ্রাম-বাংলার মানুষদের ছোটো ছোটো গল্প, সংগীত ও ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে সারা বাংলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করে মানুষকে সেই পথে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মানুষ যাতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে পায় এবং তারা মনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে সবল ও সক্ষম হয় তারই শিক্ষা দিয়েছিলেন। মানুষকে সক্ষম ও সচেতন করার জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জগৎকে মায়া বলে উল্লেখ করে, মানুষকে বিদ্যামায়া গ্রহণ করতে এবং অবিদ্যামায়া ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের গোড়ামি দূর করার জন্য ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মমতের অভ্যাস করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকল মতই একই ঈশ্বরের পথে মানুষকে চালিত করে। তাই সকল মানুষকে তিনি বিভিন্নভাবে চলতে পরামর্শ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সৃজনশীল লোকশিক্ষকের সমস্ত গুণই ছিল, আর সেই কারণে মানুষ তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছে। তিনি মানুষকে সাধাণভাবে শিক্ষা দেননি, মানুষের মনের আধারে সঞ্চার করেছিলেন শক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আর সেই কারণে সকল জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল পেশার মানুষ, দলে দলে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মীয় শিক্ষা জনমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, শুধু তাই-ই নয় হাজার হাজার মানুষ আবার নতুন করে ইশ্বরে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল।

৬. উপসংহার : লোকশিক্ষা হল লোকের শিক্ষা, লোকের জন্য শিক্ষা, লোকসংস্কৃতির দ্বারা শিক্ষা। প্রত্যেক লোককে বা জনসাধারণকে তাদের মানসিক, সামাজিক, দৈহিক ও প্রক্ষোভিক জীবনকে শুনতে, দেখতে এবং ভাবতে শেখাতে হবে। তাদের নিজের শক্তিকে ব্যবহার করার নীতি ও কৌশলগুলি জানাতে হবে। লোকসমাজের মানুষকে তার জীবনের সব রকম সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ শিখিয়ে দিলেই সে সচেতন হবে। এ জন্য গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেদের কাছে লোকশিক্ষা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটি সাধনা। লোকশিক্ষা লোকদর্শনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমরা কে? এই পৃথিবী বা জগৎ কী? এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? বিশেষত এইসব প্রশ্নগুলির উওর খোঁজার মধ্যে দিয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছোটো ছোটো গল্প, সঙ্গীত, ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে লোকসমাজের বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্রেই মানবীয় গুণ ও বিবেকের উদ্বোধন সহজতর করে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে, ঐতিহ্যগতভাবে সমগ্র সমাজেই প্রভাবিত হয়ে চলেছে। তাই আজ যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বাণী, ছোটো ছোটো গল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সমগ্র সমাজের কাছে সঞ্জীবন সুধা হিসাবে মঙ্গলময় হবে নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূত্র:

১) দত্ত, রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৯।

২) স্বামী, ভজনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্রঃ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৯-২১।

৩) রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৪-২০১৫, পৃ. ৩।

৪) চৌধুরি, দুলাল (সম্পাদিত),'লোকসংস্কৃতি', বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২২।

৫) Leach, Edward Maria (ed.), Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Vol-I, New York, 1949, PP. 401.

৬) Sokolov Y. M, Assuan Folklore, New Yourk, 1950, PP. 15.

৭) চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ, লিঃ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫২।

৮) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৪, পৃ. ৫৩।

৯) স্বামী, তেজসানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৯।

১০) দত্ত, রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪।

১১) স্বামী, তেজসানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩।

১২) দত্ত, রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৪।

১৩) স্বামী, তেজসানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৭।

১৪) স্বামী, ভজনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্রঃ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫।

১৫) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বেলুড়মঠ, হাওড়া, ২০০৭, পৃ. ১৯।

১৬) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১০, পৃ. ২৪।

১৭) স্বামী, সর্বভূতানন্দ (সম্পাদক), অমৃতবাণী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩- ৪।

১৮) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বেলুড়মঠ, হাওড়া, ২০০৭, পৃ. ৩১-৩২।

১৯) স্বামী, মাধবানন্দ(সম্পাদক), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৭।

২০) শ্রীম কথিত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৪।

২১) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৫০।

২২) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৪২।

২৩) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৬১।

২৪) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৪২।

২৫) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৪৩।

২৬) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৩০।

২৭) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ১৩।

২৮) পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৫, পৃ. ৮।

২৯) স্বামী, সর্বভূতানন্দ (সম্পাদক), অমৃতবাণী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩-৪।

গ্রন্থপঞ্জি :

১) দত্ত, রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪।
২) রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৪-২০১৫।
৩) চৌধুরি, দুলাল সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪।
৪) Leach, Edward Maria (edited), Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Vol-1, New York, 1949.
৫) Sokolov Y. M, Aussian Folklore, New York, 1950.
৬) চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০২।
৭) স্বামী, তেজসানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫।
৮) দত্ত, রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪।
৯) স্বামী, ভজনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্রঃ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪।
১০) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বেলুড়মঠ, হাওড়া, ২০০৭।
১১) স্বামী, সর্বভূতানন্দ (সম্পাদক), অমৃতবাণী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০০৮।
১২) শ্রীম কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০।
১৩) পাঠক, যোগেশ রঞ্জন, লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৩৮৬।
১৪) চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, বুকট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯৯।
১৫) স্বামী তেজসানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০ ১৫।

Website:

১) www. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna.viewedon.27.03.2016.